SPARTACIST

দলিতদের মুক্তিলাভ : ভারতীয় শ্রমিক বিপ্লবের চাবিকাঠি

হাতিদের মাঝে পিঁপড়ে (Ants Among Elephants) : একটি পর্যালোচনা

নিচের লেখাটি ২০শে এপ্রিল ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত Workers Vanguard (WV) *(ওয়ার্কার্স ভ্যানগার্ড)-এর ১১৩২ নং সংখ্যায় ছাপা একটি ইংরেজি লেখা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। WV হল ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট লীগ (ফোর্থ ইন্টারন্যাশনালিস্ট)-এর শাখা স্পার্টাসিস্ট লীগ, ইউ.এস.-এর মার্ক্সবাদী পত্রিকা।*

আধুনিক ভারতবর্ষের ঝকঝকে আইটি সেন্টার ও পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি দেখলে বহুলোকের মনে যে মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হল, অস্পৃশ্যতার কারণে সমাজের কিছু মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বাস্তব কিন্তু এই বিভ্রান্তি থেকে অনেক, অনেক দূরে। অস্পৃশ্যতা এখনও জাতিভেদ প্রথার একেবারে মূলে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিটি স্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা ঢুকে আছে এবং এখনও তার অপপ্রয়োগ অব্যাহত আছে। সুজাতা গিড্‌লার লেখা ২০১৭ সালের বই *Ants Among Elephants: An Untouchable Family and the Making of Modern India* অনেকগুলি ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছে, যে ধারণাগুলি এতদিন ধরে অস্পৃশ্যতাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে সাহায্য করেছে ও এখনও করে থাকে। জাতিভেদ প্রথার কারণে মানুষ কি ভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর পরিবারের দিক থেকে যে লড়াই এখনও চলেছে, তার একটা স্পষ্ট ও ধারালো ছবি গিড্‌লা এঁকেছেন তাঁর বইতে। সমালোচকদের কাছ থেকে বিপুল সমাদর পেয়েছে বইটি এবং পড়তে শুরু করলে শেষ না করে পাঠক রেহাই পাবেন না।

দারিদ্র্য থেকেই যে অস্পৃশ্যতা নামক সামাজিক কলঙ্কের উদ্ভব, তা নয়। শিক্ষা ও সামাজিক ক্রম-উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অস্পৃশ্যতাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। গিড্‌লা এই সত্যটা সহজ ভাবেই প্রকাশ করেছেন: "আমার জন্ম হয়েছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত একটা পরিবারে। আমার মা বাবা দু'জনেই কলেজে পড়াতেন। আমি কিন্তু জন্ম থেকেই একজন অস্পৃশ্য।" তিনি "দলিত" কথার বদলে "অস্পৃশ্য" কথাটা ব্যবহার করে থাকেন, কারণ এই কথাটার মাধ্যমে যা প্রকাশ পায়, সমাজের এই অংশের জনগণের কাছে সেটাই জীবনের বাস্তব সত্য। ১৯৪৭ সালে বৃটেনের কাছ থেকে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা পায়, তখন থেকে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা সরকারী ভাবে অবলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে, এবং সেই সময় থেকে এই দেশে বিভিন্ন দিকে বিপুল পরিবর্তনও এসেছে। কিন্তু ২২ কোটি দলিত ভারতবাসীর অধিকাংশেরই জীবনে প্রায় কোনও পরিবর্তন আসে নি, জাতিভেদের নির্যাতনের হাত থেকে তারা আজও স্বাধীনতা পায়নি।

Ants Among Elephants বইটি একাধারে লেখিকার পারিবারিক স্মৃতিকথা এবং তারই সঙ্গে তাঁর মামা কে জি সত্যমূর্তি (১৯৩১-২০১২)-র রাজনৈতিক জীবনেরও বিবরণ,

Liberation of Dalits: Key to Indian Workers Revolution
***Ants Among Elephants*: A Review**
For a Leninist Party to Fight Caste Oppression!
(Bengali translation from *Workers Vanguard* No. 1132, 20 April 2018)

জাতিভেদ প্রথার নিগ্রহের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য চাই একটি লেনিনপন্থী পার্টি !

India	**Rs 5**	**Australia**	**$0.10**	**Canada**	**$0.10**	**South Africa**	**R0,10**
Bangladesh	**৳ 5**	**Britain**	**10p**	**Europe**	**€0.10**	**USA**	**$0.10**

যিনি মাওপন্থী গেরিলা দলের একজন স্বনামধন্য নেতা হয়ে উঠেছিলেন । অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের স্টালিনপন্থী দলগুলির কুখ্যাত রেকর্ডের উপরে বইটি তীব্র আলোকপাত করেছে । কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ ইন্ডিয়া (সিপিআই) এবং তাদেরই দলছুটদের নিয়ে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) (সিপিআই[এম]) সর্বহারাদের স্বাধীনতার লড়াইকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং তার ফলে তারা সামাজিক বিপ্লবের লড়াইকেও প্রত্যাখ্যান করেছে । পরিবর্তে তারা শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের স্বার্থগুলিকে বুর্জোয়াদের পায়ের তলায় ঠেলে দিয়েছে। জন্মমুহূর্ত থেকেই বলা যায়, সিপিআই সমাজের ব্রাহ্মণ্য জাতির (উচ্চবর্ণের) হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মুখপাত্র কংগ্রেস পার্টির উপাঙ্গ হিসাবে কাজ করেছে। সিপিআই ও সিপিআই (এম) কখনওই জাতিভেদ প্রথা দ্বারা নির্যাতিত জনগণের জন্য লড়াই করতে চায়নি, সেই লড়াইকে তারা শ্রেণী সংগ্রামের পরিপন্থী বলে মিথ্যা ভান করেছে । এটা লেনিনবাদের বিপরীত । আমরা বলশেভিক নেতা ভি আই লেনিন (V.I. Lenin)-এর পথ অনুসরণকারী, যিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন সমাজের যেখানে যে নিপীড়িত হচ্ছে তাদের সকলের জন্য বিপ্লবী কর্মীদের সংগ্রাম করতে হবে, জনতার "স্বার্থরক্ষক হিসাবে" কাজ করতে হবে।

অস্পৃশ্যতা এক ধরনের ***বিশেষ সামাজিক নিপীড়ন***, যাকে সাধারণ শ্রেণী শোষণ বলে অভিহিত করা যায় না, যদিও দুই ধরনের নিপীড়নের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে । বিশেষ সামাজিক নিপীড়নের একটা অতি পরিচিত দৃষ্টান্ত হল মহিলাদের পদানত করে রাখা, পুঁজিবাদের যা একটা প্রধান অবলম্বন; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খেটে-খাওয়া মহিলাদের উপরে থাকে দ্বিগুণ নিষ্পেষণ- এক মহিলা হিসাবে, ও দুই শ্রমিক হিসাবে। বহু প্রকার নিষ্পেষণের উদাহরণ আছে ভারতবর্ষে, যার মধ্যে আছে ধর্ম, ভাষা, জাতি ও নাগরিকত্বের কারণে নিষ্পেষণ। এই মাসেই ভারতীয় সেনাবাহিনী, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত মুসলমান-গরিষ্ঠ কাশ্মীরে এক দিনে দশজনকে মেরেছে বন্দুকের গুলিতে।

রণকৌশলের দিক দিয়ে বিচার করলে, দলিতদের প্রতি সামাজিক নিপীড়নের দিকে নজর দেওয়াটা মার্ক্সবাদীদের জন্য একটা আবশ্যক বিষয় । দলিতদের মুক্তির জন্য আন্দোলনের কথা চিন্তা না করলে ভারতবর্ষে কোনও সামাজিক বিপ্লব সম্ভব নয়। শ্রমিক শ্রেণীর একেবারে কেন্দ্রস্থলে রয়েছে দলিত গোষ্ঠী। আজ পর্যন্ত, জাতিভেদ প্রথার নিপীড়নের ক্ষেত্রে লেনিনবাদের যথার্থ প্রয়োগের কোনও ইতিহাস বা পূর্ব উদাহরণ ***নেই***। ভারতবর্ষে একটা যথার্থ লেনিনপন্থী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে জাতিভেদ প্রথার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির জন্য, এবং দলিতদের মুক্তিদান করার লক্ষ্যে আমরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট লীগ (চতুর্থ আন্তর্জাতিকবাদী)-এর মার্ক্সবাদীরা সঙ্কল্পবদ্ধ।

জাতিভেদ প্রথার নির্যাতনের অবমাননা

ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতিতে, সুপ্রাচীন জাতিভেদ প্রথা প্রোথিত রয়েছে ঐতিহাসিক সূত্রে। ধনবান উচ্চবর্ণের জাতিরা নিম্নবর্ণের জাতি এবং অসংখ্য উপজাতির মানুষের উপরে আধিপত্য করে । প্রত্যেক জাতি তার উপর তলার জাতিকে তোষণ করে, আর নিচের তলার জাতির মুখ মাটিতে রগড়ে দেয়। কিন্তু, জাতি ও জাতিচ্যুতদের মধ্যে গভীর ফাটলের মত যে তফাৎটা আছে, তার তুলনায় জাতিভেদের এই ফারাকগুলি কোথাও ততটা মৌলিক বা তত বিষাক্ত নয় । নরকের মধ্যে "অস্পৃশ্যদের" জন্য একটা বিশেষ স্থান বরাদ্দ করা আছে, যাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামাজিক ভাবে পৃথক করে রাখা হয়েছে সব জাতির নিচে, এবং অনেক সময়ে বাস্তবেও। গিড্‌লা লিখেছেন : "সমাজের অস্পৃশ্যরা, যাদের বিশেষ ভূমিকা - বংশানুক্রমিক কর্তব্য - হল অন্যদের জমিতে পরিশ্রম করে ফসল ফলানো অথবা সেই কাজগুলি করা, যা হিন্দু সমাজ অত্যন্ত নোঙরা ও ঘৃণ্য বলে মনে করে, গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে বসবাস তাদের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ। তাদের থাকতে হয় গ্রামের সীমানার বাইরে। তাদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। যে পানীয় জলের উৎস অন্য জাতির লোকেরা ব্যবহার করছে, সেই উৎসের ত্রিসীমানায় তাদের আসতে দেওয়া হয় না; উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পাশাপাশি বসে, বা একই বাসন থেকে খাবার অধিকার তাদের নেই। এমন হাজার হাজার নিষেধের গণ্ডী ও অপমানের বাধা আছে, যা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আকার নেয়। প্রতিদিন আপনি ভারতীয় খবরের কাগজে পড়তে পারবেন, কোথায় কোন অস্পৃশ্যের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে বা তাকে খুন করা হয়েছে কারণ সে পায়ে চটি পরেছিল বা সাইকেল চড়েছিল।"

গত বছর গুজরাটে, একজন দলিতকে উচ্চ জাতির গুণ্ডারা পিটিয়েছিল কারণ সে "গোঁফ রাখার" দুঃসাহস দেখিয়েছিল বলে। মার্চ মাসের শেষের দিকে, একটি দলিত যুবককে নির্মম ভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল কারণ সে নিজের ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছিল।

গিড্‌লার প্রপিতামহ/মহী বা প্রমাতামহ/মহী ছিলেন জঙ্গলের আদিবাসী, তাঁদের জন্ম হয়েছিল ১৮৮০-র দশকের শেষ দিকে। তাঁরা হিন্দু ছিলেন না, তাঁদের নিজস্ব দেবদেবীকে তাঁরা পুজো করতেন। বৃটিশ শাসকেরা বনাঞ্চল পরিষ্কার করে সেগুন কাঠের গাছ পুঁতবে বলে, জঙ্গলের বাসস্থান থেকে তাঁদের উৎখাত করে। গিড্‌লার পূর্বপুরুষেরা একটা পড়ে থাকা জমিতে চাষবাস করে ফসল ফলাতেন, কিন্তু স্থানীয় দুর্বৃত্ত জমিদার বৃটিশদের তরফে

তাঁদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে শুরু করে। খাজনা বাকি পড়ে যাওয়ায় পরিবারটির উপরে ঋণের বোঝা চাপে এবং এক সময় তাঁরা বাধ্য হন জমিদারের হাতে জমি তুলে দিতে। তাঁরা তখন ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হন। আদিবাসীদের এই ভাবে ক্রীতদাসে পরিণত করার প্রথা আজও অব্যাহত আছে।

গিড্‌লার পরিবার খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং বইটার লেখিকা সুজাতা একটা দলিত বস্তিতে বড় হয়ে ওঠে, সেই অঞ্চল তখন অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল, এবং সেখানে খ্রীস্টান ও "অস্পৃশ্য" সমার্থক ছিল। তার "এমন কোনও খ্রীস্টানের কথা জানা ছিল না, হিন্দুদের উপস্থিতিতে যে নতজানু হয়ে পড়ত না" এবং "এমন কোনও হিন্দুকেও জানা ছিল না যার সামনে কোনও খ্রীস্টান এসে দাঁড়ালে, তার দৃষ্টি খ্রীস্টানের দেহ ভেদ করে চলে যেত না যেন সেই মানুষটা সেখানে একেবারেই উপস্থিত নেই।" গিড্‌লার বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর তখন সে প্রথম খ্রীস্টান ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্ব জানতে পারে, যা তাকে একেবারে আশ্চর্য করে দিয়েছিল। তারা হল নাম্বুদিরিপাদ, প্রধানতঃ কেরালার বাসিন্দা।

জাতিভেদপ্রথা ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজের মজ্জায় মজ্জায় এমন ভাবে গেঁথে আছে, যে বলতে গেলে প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী সেই প্রথা মেনে চলে, যাদের মধ্যে মুসলমান. খ্রীস্টান, শিখ ও বৌদ্ধরাও আছে। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশকেই "অস্পৃশ্য" বলে গণ্য করা হয় এবং অনেক সময়েই তারা সাম্প্রদায়িক নিগ্রহের শিকার হয়ে থাকে। এই মাসে, আসিফা নামে বেদুইন মুসলমান পরিবারের আট বছরের একটি মেয়ের উপরে অত্যাচার, ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গর্জন উঠেছিল। এটা ছিল কাশ্মীরের হিন্দু দুর্বৃত্তদের একটা পরিকল্পিত ও নৃশংস আচরণ। বাঙলাদেশের সমাজের পরিত্যক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে রোহিঙ্গারা, মায়ানমারে যাদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের যে সব দরিদ্র খ্রীস্টানেরা উগ্র ইসলামপন্থীদের সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়ে থাকেন (সেই সন্ত্রাসের মধ্যে "ধর্মীয় অবমাননার" অভিযোগও আছে), তাঁদের অধিকাংশকেও সমাজে পরিত্যক্ত বলে গণ্য করা হয়। জাতিভেদের ভিত্তিতে সামাজিক নিগ্রহের হাজারো উদাহরণ পাওয়া যায় নেপালে এবং শ্রীলঙ্কাতেও, যেখানে তামিল ও সিংহলী দুই পক্ষই সেই অত্যাচারের জন্য দায়ী। গিড্‌লা, যিনি এখন থাকেন নিউ ইয়র্কে আর সাবওয়েতে কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করেন, তিনি বলেন ইউএস-এতে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে জাতিভেদের কারণে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ খুবই চোখে পড়ে।

গিড্‌লার পিতামহ/মহী বা মাতামহ/মহী খ্রীস্টান মিশনারীদের স্কুলে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। সাধারণতঃ দলিতদের মধ্যে অধিকাংশকেই যে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, শিক্ষা তাঁদের ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের সেই দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরিবার অস্পৃশ্যতার বন্ধন থেকে মুক্তি পায় নি। গল্পের একটা প্রধান চরিত্র হলেন মঞ্জুলা, যিনি লেখিকার মা। দলিত মহিলাদের যে নির্যাতন সহ্য করতে হয় তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় এই চরিত্রচিত্রণে। সমগ্র একান্নবর্তী পরিবারের জন্য ঘরের কাজ, রান্না ও পরিচর্যা, সবই করতে হত মঞ্জুলা ও পরিবারের অন্য মহিলাদের। মঞ্জুলার বড় দাদা মঞ্জুলার জন্য স্বামী পছন্দ করে এনেছিলেন, এবং সেই স্বামী তার নিজের মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মঞ্জুলাকে ধরে মারত। এত সত্ত্বেও, এই পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করে মঞ্জুলা এম এ পাশ করেন।

গিড্‌লার পরিবার থাকত শহরে, যার ফলে গ্রামদেশে জাতিভেদ প্রথার অজুহাতে যে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা চালু ছিল, তা থেকে তাঁরা পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। দলিত সমাজের মহিলারাই বিশেষভাবে উচ্চবর্ণের পুরুষদের হিংস্র আচরণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকেন। মহিলাদের ও একই সঙ্গে তাদের জাতিকেও অপমান করার জন্য এই পুরুষেরা ধর্ষণকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। অন্য কোনও জাতির মানুষের সাথে দলিতদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার পরিণতিও ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। ফেব্রুয়ারী মাসে, একটি ২০ বছরের মেয়েকে তার বাবা জোর করে বিষ খাওয়ায়। মেয়েটির মাও এই কাজে তার স্বামীকে সাহায্য করেছিল। বেশ কয়েক ঘন্টা অপরিসীম কষ্ট সহ্য করার পর মেয়েটি মারা যায়। বাবা পুলিসের কাছে বলে, "এটা হল তার মেয়ের জন্য একটা ন্যায্য শাস্তি, কারণ সে তার সম্প্রদায়ের বাইরের একটি মানুষকে ভালোবেসেছিল", অর্থাৎ একজন দলিতকে।

শহরে, মানুষের জাতি বিচার কম চোখে পড়ে। কিন্তু দেশের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সকলের অধিকার আছে জানবার, এবং তুমি যদি সত্য গোপন কর, তাহলে তোমার জাত কি তা প্রকাশ হয়ে পড়ার অসংখ্য উপায় আছে। দলিত ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ করছে, যা কিনা ব্রাহ্মণত্বের পীঠস্থান। ২০১৬ সালে রোহিথ ভেমুলা নামে হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দলিত ছাত্রের পিছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উগ্র হিন্দুপ্রেমী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার এমন ভাবে তাড়না করতে শুরু করে যে শেষ পর্যন্ত ছেলেটি আত্মহত্যা করে। তার শেষ চিঠিতে সে লিখে যায়, "আমার জীবনের মরণান্তিক দুর্ঘটনাটি হল আমার জন্ম।" এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে, উত্তরপ্রদেশের কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দলিত ছাত্রকে পিটিয়ে খুন করা হয় কারণ সে আচমকা এক উঁচু জাতের হিন্দুকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। ঠিক গিড্‌লা যেমন বলেছেন, "তোমার জীবন হচ্ছে তোমার জাতি, তোমার জাতি হচ্ছে তোমার জীবন।"

গড়ে, প্রতি ১৫ মিনিটে দলিতদের উপরে একটা অপরাধ ঘটে থাকে। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর

থেকে দলিতদের উপরে আক্রমণের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিস্ অ্যাক্ট (অর্থাৎ নির্যাতন নিবারণ আইন), যে আইনবলে দলিতদের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য আদালতে বিচারের জন্য, নাম-কে-ওয়াস্তে হলেও, আবেদন করা সম্ভব হত, সেই আইনের ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ায় গত ২রা এপ্রিল দলিতরা সারা ভারত ব্যাপী একটা বিশাল *বন্ধ* ডাকে। পুলিস নির্মম হাতে বিক্ষোভকারীদের দমন করে, অন্ততঃপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু ঘটে, বেশ কিছু লোক আহত হয় এবং হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও আইন উচ্চবর্ণের দুর্বৃত্তদের হাতে দলিতদের খুনখারাপির শিকার বা পঙ্গু হওয়ার থেকে কোনও নিরাপত্তাই দেয় না বললেই চলে, কারণ তারা প্রায় সর্বসময়েই শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবুও আদালতের এই রায় জাত-বৈষম্যকারী গুণ্ডাদের দলগুলিকে আরও হিংস্র, আরও ভয়ানক আক্রমণ চালানোর জন্য সবুজ বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বস্তুতঃ উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক নেতারা ও তাদের মুখপাত্রেরা দীর্ঘ দিন ধরেই এই আইন প্রত্যাহার করার জন্য তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল।

স্টালিনবাদ : জাতিভেদের বিষয়ে জঘন্য একটা চিরকালীন প্রথা

Ants Among Elephants বইটির কেন্দ্রবিন্দু, স্বজাতা গিড্লার মামা কে জি সত্যমূর্তি ছাত্রাবস্থায় কংগ্রেসের ডাকে বৃটিশদের বিরুদ্ধে কুইট ইন্ডিয়া (ভারত ছাড়ো) আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কংগ্রেসের উপরে আস্থা হারান এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি-তে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার সময় তিনি সচেতন ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন যে, "আমাদের কেবল শ্রেণীর কথাই ভাবতে হবে, জাতি বা বর্ণের কথা নয়। যখন শ্রেণী সংগ্রামে আমরা জয়ী হতে পারব, তখন জাতিভেদ আপনা থেকেই লোপ পাবে।" এই ধরনের জঘন্য লাইনের মাধ্যমে ভারতের স্টালিনপন্থী পার্টিগুলি জাতিভেদের প্রশ্নে কমিউনিজম্-এর পতাকাকে মলিন করেছে, ঠিক যে ভাবে তারা বিপ্লবের অন্য যে কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রেও করেছে। সমাজের মানসিকতার গভীরে প্রোথিত উচ্চ জাতিকুলের গর্ব, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক বিশাল বাধার সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক মুক্তির লক্ষ্যে যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন লেনিনপন্থী এক অগ্রণী পার্টি গড়ে তোলা, যে পার্টি দলিত জনগণের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে লড়াইএ সর্বহারাদের নেতৃত্ব দেবে।

সত্যমূর্তি সিপিআই-তে যোগ দিয়েছিলেন কারণ পার্টি তখন তেলেঙ্গানা (তখন সেটা অন্ধ্রপ্রদেশের একটা অংশ ছিল)-তে নির্যাতিতদের মধ্যে একটা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, যে ধরনের কাজ স্টালিনপন্থীরা সচরাচর করে না। তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৫১) ছিল হায়দ্রাবাদের নিজামের নিষ্ঠুর শাসনের বিরুদ্ধে একটা অভ্যুত্থান। নিজামের শাসনকে মদত দিয়েছিল বৃটিশ; কি ভাবে উপনিবেশকারীদের সমর্থন দেশের জাতিভেদ প্রথাকে শক্তিশালী করে তুলেছিল, তার একটা আদর্শ উদাহরণ ছিল এটা। গিড্লা লিখেছেন, " দাসত্ব আরোপ করার প্রথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছিল, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের নিজাম রাজত্বের কেন্দ্রস্থল তেলেঙ্গানার *ভেটি* পদ্ধতির মত নির্মম প্রয়োগ আর কোথাও দেখা যায় না।" এই *ভেটি* পদ্ধতিতে "গ্রামের প্রতিটি অস্পৃশ্য পরিবারের প্রথম ছেলে, যে মুহূর্তে সে হাঁটতে ও কথা বলতে পারবে, তখনই তাকে নিজামের স্থানীয় দালাল *ডোরা*-দের হাতে তুলে দিতে হত, তাদের পরিবারের দাস হিসাবে থাকার জন্য।" একই ভাবে গ্রামের সব মেয়েরা ছিল *ডোরা*-দের সম্পত্তি। গিড্লা লিখেছেন, কোনও মেয়েকে যদি কখনও কোনও *ডোরা* "ডেকে পাঠাত, তখন মেয়েটি খেতে বসলেও তাকে মুখের খাবার ফেলে ছুটতে হত *ডোরা*-কে শয্যাসঙ্গ দেবার জন্য।"

অন্ধ্রপ্রদেশে সিপিআই তেলেঙ্গানার সশস্ত্র আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়ে এবং তারা একটা গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে, যারা সেই প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের বড় বড় এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ১৯৪৮ সালে জহরলাল নেহরুর ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার তেলেঙ্গানায় সৈন্যবাহিনী পাঠায়। প্রথমদিকে নিজাম সদ্য-স্বাধীন ভারতের অধীনতা স্বীকার করতে চায় নি, কিন্তু অচিরেই সে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তার "নৃপতিশাসিত রাষ্ট্র" তুলে দেয় এবং তখন থেকে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহকে দমন করাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী তিন বছর ধরে ভারতীয় সেনারা নির্বিচারে অগণিত মুসলমান, চাষী ও আদিবাসীদের নৃশংস ভাবে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ড শেষ হবার পর সিপিআই তাদের কংগ্রেসের উপাঙ্গের ঐতিহাসিক ভূমিকায় ফিরে যায়, যে কংগ্রেস এর আগে কমিউনিস্টদের গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবার হুকুম জারী করেছিল। গিড্লা অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে সিপিআই নেতৃবর্গ "নেহরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে, এমন কি যে দশ হাজার পার্টি সদস্য বিনা বিচারে বন্দিশিবিরে বসে পচছে, তাদের সকলের জন্য বেকসুর খালাসের দাবীও না করে।"

সিপিআই-এর সশস্ত্র আন্দোলন পরিত্যাগের সিদ্ধান্তে সত্যমূর্তি একেবারে ভেঙে পড়েন, এবং পরে আরও মর্মাহত হন, যখন জানতে পারেন যে এই মোড় ঘোরানোতে স্টালিনের অনুমোদন ছিল। ১৯৬৪ সালে, সিপিআই সোভিয়েটপন্থী ও চীনপন্থী, এই দু'টি ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। সত্যমূর্তি

চীনপন্থীদের উপদলটিকে সমর্থন করেন, যে গোষ্ঠী পরবর্তী কালে সিপিআই(এম)-এ পরিণত হবে। মাও-এর নেতৃত্বে যেমন কৃষক বাহিনী জয়ী হয়েছিল, সত্যমূর্তি আশা করেছিলেন যে সেই ভাবে "চীনপন্থী"-রা মাও-এর পথ অনুসরণ করবে। কিন্তু সিপিআই(এম) তাদের প্রথম সম্মেলনে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে চলার সপক্ষেই ভোট দিল।

১৯৬৭ সালে সিপিআই(এম) যখন পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিবাদী সরকারে যোগ দিল, তখন কিছু কর্মী দল ছেড়ে নকশালবাড়ির সশস্ত্র বিদ্রোহে সামিল হয়। তারা নকশাল নামে পরিচিত হয় এবং এরা অন্ধ্রপ্রদেশের সিপিআই(এম)-এর সদস্যদের মধ্যে একটা বড় অংশকে দলে টানতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে সত্যমূর্তি সহ তেলেঙ্গানা আন্দোলনের বহু প্রবীণ সদস্যও ছিলেন। সিপিআই ও সিপিআই(এম) দুই দলই নকশালদের বিরুদ্ধে একটা রক্তাক্ত সীমারেখা টেনে দেয়। ১৯৭০-এর দশকে কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন নির্মম হাতে নকশালদের দমন করছেন, তখন সেই কাজে সিপিআই-এর পূর্ণ সমর্থন ছিল। ১৯৭১ সালের অগাস্ট মাসে কলকাতায়, নকশাল অথবা নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থক এই সন্দেহে বহু লোককে সিপিআই(এম) ক্যাডাররা, কংগ্রেস গুণ্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যথেচ্ছ ভাবে খুন করে।

এবং দলিতদের প্রতি অত্যাচারের অপরাধের কথা বলতে হলে, পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-এর কয়েক দশক ব্যাপী শাসনকালে তারাও, ভারতীয় শাসক গোষ্ঠী যা করে থাকে ঠিক সেই রাস্তাই বেছে নিয়েছিল। ১৯৭৯ সালে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন সরকার বাঙলাদেশ থেকে আগত মারীচঝাঁপি দ্বীপে বসবাসকারী শত শত দলিত হিন্দু উদ্বাস্তুদের নির্মম ভাবে হত্যা করে। ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামে সিপিআই(এম)-এর গুণ্ডারা পুলিসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রায় শতজনকে খুন করে, কারণ তারা পুঁজিবাদী শিল্প-উদ্যোগের স্বার্থে জমি দখলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছিল।

১৯৮০ সালে সত্যমূর্তি কোণ্ডাপল্লী সীতারামাইয়ার সাথে একযোগে পীপলস্ ওয়ার গ্রুপ (পিডাব্লিউজি) গঠন করেন। সীতারামাইয়া ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু ও সিপিআই-এর একজন প্রবীণ সদস্য, যিনি তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। পিডাব্লিউজি নকশালবাদীদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পিডাব্লিউজি এবং সাধারণ ভাবে নকশালরাও দলিতদের মধ্যে যথেষ্ট সমর্থন পায়, যাদের জন্য সশস্ত্র গেরিলারা রাষ্ট্র ও উচ্চবর্ণের জমিদারদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছুটা অতি-প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান করছিল। কিন্তু মাওপন্থীদের কার্যক্রম এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও রকম পথনির্দেশ করে না। "প্রগতিশীল" বুর্জোয়া মিত্রদের খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া মাওপন্থীদের কোনও রাজনৈতিক কার্যক্রম নেই, এবং "বৃহত্তর শক্তিগুলির" সঙ্গে একত্রিত হওয়ায় অনিবার্য ভাবে দরিদ্রতম কৃষকদের স্বার্থের বলিদান করা হচ্ছে। নকশালদের মতে, বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে, দলিতদের হাত মেলাতে হবে "মধ্যবর্ণের" জাতিগুলির সঙ্গে। কিন্তু বাস্তবে প্রায়শঃই দেখা যায়, জমির দলিত ও আদিবাসী মালিক বা মালিকানা-প্রত্যাশীদের প্রতি "মধ্যবর্ণের" জাতিগুলি তীব্র শত্রুভাবাপন্ন।

নকশালরা চিরকালই দলিতদের (আজকাল মূলতঃ *আদিবাসীদের*) কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতার প্রশ্নের রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করায় তারা চিরকালই নারাজ। ১৯৮৪ সালে পিডাব্লিউজি-র ভিতরে এই বিষয়টা বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ে, যখন অল্পবয়সী দলিত পার্টি সদস্যরা সত্যমূর্তির কাছে এসে পার্টির কাজকর্মের মধ্যে জাতবৈষম্যকারী ব্যবহার ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে : নাপিত সম্প্রদায়ের কমরেডদের অন্য কমরেডদের দাড়ি কামাতে বলা হচ্ছে; ধোবা সম্প্রদায়ের কমরেডদের অন্যদের কাপড় কাচতে বলা হচ্ছে; দলিত সদস্যদের বলা হচ্ছে ঘর ঝাড়ু দিতে ও পায়খানা পরিষ্কার করতে। উচ্চবর্ণের পার্টি কমরেডদের কাছ থেকে এই ধরনের জাতিভিত্তিক কাজ বন্টনের অভিজ্ঞতা সত্যমূর্তির নিজেরও ছিল। তিনি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য সেন্ট্রাল কমিটি-র একটা মিটিং ডাকেন। গিড্‌লা লিখছেন, পার্টির নেতৃবর্গ কি ভাবে তার উত্তর দিল - "তারা 'পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে' তৎক্ষণাৎ সত্যমূর্তিকে দল থেকে বহিষ্কার করে দিল"। নিজেদের সদস্যদের মধ্যে জাতিভেদের অস্তিত্ব বা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগও না দিয়ে, তারা প্রমাণ করে দিল যে মাওপন্থী পিডাব্লিউজি-দের রাজনৈতিক মূল সিপিআই-এর মধ্যেই শিকড় গেড়ে আছে।

এম এন রায়ের হাতে লেনিনবাদের বিকৃতিকরণ

জাতিভেদ প্রথার নিপীড়নের প্রশ্নে ভারতবর্ষের তথাকথিত মার্ক্সবাদীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা যে কতদূর হত-দরিদ্র সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে *Ants Among Elephants*। ভারতবর্ষের জন্য একটা বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গীর রূপরেখা রচনা করাই এখন যথার্থ কমিউনিস্টদের করণীয় কাজ। মার্ক্সবাদীদের অবশ্যই যা করতে হবে তা হল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়া পর্যন্ত, এবং বিপ্লব সফল হবার পরেও, দলিত ও আদিবাসীদের উপরে প্রতিনিয়ত যে নিপীড়ন চলছে সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য ও হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখা। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (সিআই)-এর প্রথম চারটি মহাসম্মেলন থেকে লভ্য শিক্ষা আইসিএল কাজে লাগাতে চায়। আমরা ভারতবর্ষে এমন একটা দল গঠন করতে চাই,

যাদের অস্ত্র হবে স্থায়ী বিপ্লবের একটা কার্যক্রম, যে কার্যক্রমের ভিত্তিতে বলশেভিকদের নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল। লেনিন ও ট্রটস্কীর নেতৃত্বে, এবং দরিদ্রতর কৃষকশ্রেণী ও সমাজের নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের সমর্থনে বলশেভিকরা সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। নিপীড়িত রাষ্ট্রগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, আইনতঃ মহিলাদের সম্পূর্ণ সমানাধিকার এবং ভূমিহীন কৃষকদের জমি পাবার অধিকার দিয়ে সোভিয়েট সরকার সুদূরপ্রসারী আইন জারী করেছিল।

১৯২০ সালে লেনিন কৃষিসম্বন্ধীয় প্রশ্নের উপর কয়েকটি তর্কমূলক বক্তব্যের একটা খসড়া তৈরি করেন, যেটা আজকের ভারতবর্ষের জন্যও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে ঠেকে। কৃষক আন্দোলনের জন্য মাওপন্থীদের কর্মকৌশল, যা খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইএর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, তার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি নির্দিষ্ট ভাবে বলেছিলেন, "কমিউনিস্ট সর্বহারাদের সঙ্গে হাত না মেলালে কখনও গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়"। তিনি আরও বলেছিলেন, "পুঁজি ও যুদ্ধের জোয়াল থেকে মানবসমাজকে মুক্তি দেবার যে যুগান্তকারী ব্রত শিল্পশ্রমিকরা নিয়েছিলেন, সেই কাজ তাঁরা কোনও দিন সম্পন্ন করতে পারবেন না, যদি তাঁরা কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ পেশায়, বা বাণিজ্যিক স্বার্থে, জীবিকার প্রয়োজন মেটাতে, অথবা ব্যক্তিগত পরিস্থিতির উন্নতি করায় নিজেদের আবদ্ধ রেখে চরিতার্থ বোধ করেন।"

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এম এন রায়, লেনিনবাদের একটা বিকৃত সংস্করণ ভারতীয় উপমহাদেশে আমদানী করেছিলেন এবং সদ্য জন্ম নিতে চলেছে এমন আন্দোলনটাকে তিনি ঠেলে দিয়েছিলেন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের খপ্পরে। ১৯২২ সালেই, রায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির জন্য একটা ইস্তাহার প্রস্তুত করেছিলেন, যাতে তিনি সংগঠনটিকে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়, উভয় গোষ্ঠীর পুরোভাগে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জোরালো তাগাদা দেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকে, রায়ের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বাঙলায় একটা কৃষক ও শ্রমিকদের পার্টি গঠন করা হবে। একক একটা সর্বহারা পার্টি যা কৃষক সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দেবে, সেটা গঠন করবার জন্য লড়াই না করে রায় দুই শ্রেণীভিত্তিক একটা পার্টি (অর্থাৎ একটা বুর্জোয়া পার্টি) গঠন করতে চাইলেন, যেখানে অনিবার্যভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থগুলিকে পাতি-বুর্জোয়া কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হত।

রায়ের রাজনৈতিক কর্মসূচীটি ছিল ১৯২০ সালের সিআই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে অঙ্কিত পরিপ্রেক্ষিতের ছকের ঠিক বিপরীত, যদিও তিনি নিজেও সেই মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। লেনিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, "কলোনীগুলি বা পিছিয়ে থাকা দেশগুলির বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে একটা অস্থায়ী জোটে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-কে অবশ্যই যোগ দিতে হবে, কিন্তু সিআই কোনও সময়েই তাদের অঙ্গীভূত হবে না, এবং সব পরিস্থিতিতেই তাদের সর্বহারা আন্দোলনের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে, এমন কি সেই আন্দোলন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও" ("Preliminary Draft Theses on the National and the Colonial Questions," 1920)। সিআই যখন জাতীয়তাবাদী স্টালিনপন্থী আমলাদের আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের আওতায় এল, তখন ১৯২৭ সালে রায় চীন দেশে এলেন স্টালিনের প্রতিনিধি হয়ে। স্টালিনের নির্দেশে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া কুয়োমিন্টাং-এর ভিতরেই থেকে গেল, যদিও ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে সাঙহাইতে কুয়োমিন্টাং-এর নেতা চিয়াঙ কাই-শেক আকস্মিক ভাবে ক্ষমতা দখল করে লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন শ্রমিকদের নিরস্ত্রীকৃত করে হত্যা করলেন ("M.N. Roy, Nationalist Menshevik," *Spartacist* [English-language edition] No. 62, Spring 2011 দেখবেন)। চীনদেশের এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ছিল স্টালিনের নির্দেশ অনুসারে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের অধীনে সর্বহারাদের রাখার সিদ্ধান্তের একটা তিক্ত ফলাফল। এর দুই দশক পর, ভারতের স্টালিনপন্থীরাও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করার উপযুক্ত পুরষ্কার পেল, যখন নেহরু ও তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল, যিনি "ভারতের লৌহ মানব" ("Iron Man of India") বলে খ্যাত ছিলেন, তাঁদের হাতে তেলেঙ্গানার কমিউনিস্ট পরিচালিত কৃষক অভ্যুত্থানকে দমন করা হল রক্তে স্নান করিয়ে।

ব্রাহ্মণত্বের দম্ভের কাছে আত্মসমর্পণ করাতে, সিপিআই-এর পক্ষে দলিতদের নিপীড়নবিরোধী সংগ্রামে যোগ দেওয়া প্রথম থেকেই অসম্ভব হয়ে গেল। এটার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯২০-র দশকের শেষ দিকে, যখন দলিত সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক নেতা ডক্টর বি আর আমবেদকরের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র প্রদেশে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গণ বিক্ষোভ শুরু হল। সেই সময়, কমিউনিস্টরা বোম্বাইয়ের কাপড় বোনার কারখানাগুলির সংগ্রামী সর্বহারাদের মধ্যে যথেষ্ট সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল। এই কারখানাগুলিতে তাঁত বোনার কাজ দলিত শ্রমিকদের করতে দেওয়া হত না, কারণ সেই কাজের পারিশ্রমিক বেশি ছিল, এবং তাদের অন্য সকলের থেকে আলাদা জলের পাত্র থেকে জল খেতে বাধ্য করা হত। কর্মস্থল থেকে অস্পৃশ্যতার অবলুপ্তি এবং প্রতিটি শ্রমিকের সমান পারিশ্রমিকের দাবীতে ***সকল*** শ্রমিকদের সমর্থন আদায় করে নেবার জন্য একটা লেনিনপন্থী পার্টি কিন্তু সর্বস্ব পণ করে লড়াই করত।

কিন্তু সিপিআই নেতারা সেই ধরণের লড়াইয়ে উৎসাহী ছিলেন না, এবং তাঁরা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না। ধৈর্যচ্যুত আমবেদকর সিপিআই নেতাদের "অধিকাংশই বামুন ছেলেপুলের দল" বলে বিদ্রুপ করেছিলেন। তাঁর শেষ মন্তব্য ছিল: "এদের হাতে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভার দিয়ে রাশিয়ানরা একটা বিশাল ভুল করেছে। হয় রাশিয়ানরা ভারতবর্ষে কমিউনিজম্ চায় নি - তারা শুধু ঢাক পেটাবার লোক চেয়েছিল - অথবা তারা বুঝতেই পারেনি।" (Selig S. Harrison, *India: The Most Dangerous Decades* [1960] থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে)।

যখন বৃটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তি পাবার প্রচেষ্টা তীব্র হয়ে উঠছে, সেই সময় জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াইকে "সাম্রাজ্যবাদবিরোধী" সংগ্রামের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি বলে সিপিআই কদর্য ও হাস্যকর ভাবে উড়িয়ে দিল। উপরন্তু, রায়ের ন্যক্কারজনক রীতি অনুসরণ করে, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতৃত্ব সিপিআই মোহনদাস ("মহাত্মা") গান্ধীর নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের হাতে ছেড়ে দিল। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার ফলে বহু দলিত জনসাধারণকে সিপিআই ঠেলে দিল আমবেদকরের পুঁজিবাদ সংস্কারসাধনের কানাগলিস্বরূপ কাঠামোর মধ্যে।

১৯৩১ সালে, "বিভেদ সৃষ্টি ও শাসন"-এর নীতিতে ওস্তাদ বৃটিশ শাসকেরা আমবেদকরকে "অবহেলিত শ্রেণীর জনগণের"একটা স্বতন্ত্র নির্বাচক গোষ্ঠী উপহার দেবার প্রস্তাব করল, ঠিক যেমন তারা করেছিল মুসলমানদের ক্ষেত্রে। এর ফলে, ভৌগলিক ভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা দলিত সম্প্রদায়ের সকলকে একই নির্বাচক গোষ্ঠীতে অঙ্গীভূত করা সম্ভব হতে পারত। আমবেদকরের অনুগামীরা মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সমতুল্য একটা পাল্টাশক্তি গড়ে তুলতে পারে, সেটা বুঝে বিচক্ষণ গান্ধী বৃটিশের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে "আমরণ অনশনের" সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। আমবেদকরের প্রতিপক্ষ হিসাবে গান্ধী নিজেকে দলিতদের নেতা ঘোষণা করলেন, যাদের তিনি মেকি দরদ দেখিয়ে "হরিজন" (অর্থাৎ দেবতার সন্তান) নাম দিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতার বিরোধীদের কোনও কোনও দাবী - যেমন মন্দিরে ঢোকার অনুমতি - নিয়ে আন্দোলন করলেও, প্রকৃতপক্ষে গান্ধী কিন্তু ছিলেন ব্রাহ্মণ্য কেন্দ্রিক জাতিপ্রথার কঠোর সমর্থক।

আমবেদকর নিজেও একটা অলীক ধারণাকে প্রতিপালন করেছিলেন যে উচ্চবর্ণের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে বৃটিশ শাসকদের একটা স্বরক্ষাপ্রাচীরের মত ব্যবহার করা যাবে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের শুরুতে তাঁর সমর্থন ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে এবং তিনি ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (রাজপ্রতিনিধির কার্যসম্পাদক পরিষদ)-এও যোগ দিয়েছিলেন। আমবেদকর অবশ্য এই ব্যাপারে একা ছিলেন না। যুদ্ধের শুরুতে গান্ধীও বৃটিশদের সমর্থন করেছিলেন, যদিও এই বিষয়ে তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের সমর্থন আদায় করতে পারেন নি। কংগ্রেস ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করে ১৯৪২ সালে, তার আগে নয়। অন্যদিকে, ১৯৪১ সালে হিটলার যখন আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে ঢুকে পড়ে, তখন থেকেই ঔপনিবেশিক জনগণের স্বার্থগুলি বিসর্জন দিয়ে স্টালিনপন্থী ভারতীয় সিপিআই-ও "গণতন্ত্রী" সাম্রাজ্যবাদীদেরই সমর্থন করেছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর, শাসক কংগ্রেস পার্টি দলিত ও আদিবাসীদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণে সম্মতি জানায় এবং তারা আমবেদকরকে নতুন সংবিধান রচনার কাজে টেনে নেয়। অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ ঘোষণা ছাড়াও সেই লিখিত সংবিধানে আরও অনেক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ছিল, এমন কি মহিলাদের জন্যও। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির অধিকাংশ কাগজেই বন্দী রইল। পরে আমবেদকর নিজেই বলেছেন: "সেই পুরাতন জুলুম, সেই পুরাতন নিপীড়ন, সেই পুরাতন বৈষম্যমূলক আচরণ। আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই চলছে, এবং হয়তো তা চলছে আরও খারাপ ভাবেই।"

চাই একটি ট্রটস্কীপন্থী পরিপ্রেক্ষিত

প্রাক-শিল্পতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে ক্রমবিবর্তনের সময় ভারতীয় সমাজ থেকে জাতিভেদপ্রথার অবলুপ্তি ঘটল না। বৃটিশ উপনিবেশবাদী শাসকেরা - বড় জমির মালিক এবং স্থানীয় উঠতি বুর্জোয়াদের সমর্থনে - গ্রামীণ সমাজের পশ্চাৎমুখিতা ও জাতিভেদপ্রথাকে সযত্নে আগলে রাখল। শুধু তাই নয়, নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে এই পরিস্থিতিকে তারা নিপুণ ভাবে ব্যবহার করতে লাগল এবং তাতে আরও ইন্ধন জোগাতে লাগল। স্বাধীনতার পরের পর্যায় দেখিয়ে দিয়েছে যে, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী শাসকেরা প্রাথমিক গণতান্ত্রিক সমস্যাগুলির কোনও সমাধান করতে অপারগ। কংগ্রেস ভূমি সংস্কার আইনের প্রবর্তন করলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু উচ্চবর্ণের জমির মালিকদের মধ্যেই জমি পুনর্বন্টিত হয়েছে।

এমন কি আজকের দিনেও, যদি কোনও দলিত জমি কিনতে সক্ষম হয় তাহলে প্রায়ই দেখা যায় তাদের উপরে দুষ্কৃতকারীদের হামলা চলছে, এবং প্রায় সর্বদাই, আইনমাফিক মালিকানার হাতবদল হতেও বছর কেটে যায় অনাবশ্যক ও ইচ্ছাপূর্বক কলহ বিবাদে। গ্রামীণ ভারতবর্ষে ভূমিহীন জনগণের আনুপাতিক সংখ্যা

ক্রমশঃই বাড়ছে। ১৯৫১ সালে ভারতের গ্রামীণ জনগণের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ ছিল ভূমিহীন, ২০১১ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ।

ভারতবর্ষের মূলধন নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক মূলধনের উপরে। জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ থাকে ছোট ছোট গ্রামে। কিন্তু গ্রামের প্রতাপশালী উচ্চবর্ণের জাতিগুলির পুঁজিসংগ্রহের মূলধন হিসাবে, গ্রামীণ এলাকাগুলি এখন আর কাজে লাগছে না, কেন না এখন তারা উত্তরোত্তর শিল্পে বিনিয়োগ করছে। তার ফলে, জমির মালিকদের জমি বাজেয়াপ্ত করা - এবং সেই জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করার লড়াই - এখন শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াদের দখলচ্যুত করার লড়াইয়ের সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রামীণ ভারত পিছিয়ে থাকলেও, এর পাশাপাশি ভারত এখন দুনিয়ার শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে পঞ্চম স্থানে পৌঁছেছে। ভারতের সর্বহারাদের সংখ্যা গ্রামীণ জনসংখ্যার তুলনায় স্বল্প, কিন্তু পুঁজিবাদীদের নিজস্ব স্বার্থে শোষণের হাত থেকে মুক্তির লড়াইয়ে কৃষক সম্প্রদায় ও সমগ্র নিপীড়িত জনসমাজকে নেতৃত্ব দেবার মত প্রয়োজনীয় সামাজিক ক্ষমতা তাদের আছে। খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে জাতিভেদপ্রথার গোপন অনিষ্টকর প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য কেবলমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেই ক্ষমতার প্রয়োগ সম্ভব।

দলিত সম্প্রদায়কে নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেবার আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে কাজ করবে। যারা এই উপলব্ধি সর্বহারাদের গভীরভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবে, লেনিনপন্থী হিসাবে আইসিএল তেমনই একটা অগ্রণী পার্টি গড়ে তোলবার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লির নিকটবর্তী গুরগাঁও-এর মারুতী-সুজুকী কারখানার যে ১৩ জন ইউনিয়ন নেতাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১২ সালে, একজন সুপারভাইসর এক দলিত কর্মীকে তার জাত নিয়ে গালি দেয়। ইউনিয়ন সেই কর্মীকে সমর্থন করে। কিন্তু কোম্পানী, যারা বহুদিন ধরেই ইউনিয়নকে পিষে চুরমার করার চেষ্টায় ছিল, তারা ভাড়া করা গুণ্ডা লাগায়। গুণ্ডাদের প্ররোচনায় একটা বিবাদ বাধে এবং তার পরে ইউনিয়নের নেতাদের জঘন্য ভাবে একটা মিথ্যা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। গত বছর, সেই ১৩ জন ইউনিয়নের সদস্যকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে ("India: Free Maruti Suzuki Union Leaders!" *WV* No. 1112, 19 May 2017 দেখুন)।

দলিত সম্প্রদায়ের অধিকারের জন্য লড়াই করছে এমনই একটি সংগঠন, ভীম আর্মি-র সমর্থনেও শ্রমিক শ্রেণীকে রুখে দাঁড়াতে হবে; উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার এদের বিরুদ্ধে নির্মম দমননীতি প্রয়োগ করেছে। কঠোর 'জাতীয় সুরক্ষা আইন'-বলে ভীম আর্মি-র নেতা চন্দ্রশেখর আজাদকে জেলে আটক করে রাখা হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে যাবতীয় (মিথ্যা) অভিযোগে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও। ইউনিয়নগুলি এবং নিপীড়িত জনগণের জন্য কর্মরত সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে দাবী করতে হবে: ***চন্দ্রশেখর আজাদকে এখনই মুক্তি দেওয়া হোক!***

ভারতীয় সমাজে জাতিভেদপ্রথাজনিত নিপীড়নের কেন্দ্রীয় ভূমিকার একটা জোরালো নিদর্শন সুজাতা গিড্লার *Ants Among Elephants* বইটিতে পাওয়া গেছে। দলিত জনগণের মুক্তির জন্য বিপ্লবী শ্রমিকদের একটা দল হাপরে পিটিয়ে গড়ে তোলা দরকার, যে দল সকল প্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ থাকবে। তেমনই, যে সকল মার্ক্সবাদীরা এমন একটা দলগঠনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প, তাদের স্টালিনপন্থীদের লজ্জাজনক উত্তরাধিকার কাটিয়ে ওঠার জন্য লড়াই করতে হবে ও ট্রটস্কীর স্থায়ী বিপ্লবের কর্মসূচীর ঝাণ্ডা শক্ত করে মাটিতে গেঁড়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। এই কার্যক্রমটি হল সর্বতোভাবেই আন্তর্জাতিক, শুধুমাত্র ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলিতেই সর্বহারা বিপ্লবসাধনের লক্ষ্যে নয়, বরং উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রগুলিকেও এটি সেই বিপ্লবের নিশানা বানিয়ে রেখেছে। আমরা যে যথার্থ লেনিনপন্থী দলটি গড়ে তুলতে চাই, তার অধিকাংশ সদস্যই হবেন দলিত এবং নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের থেকে আগত। দলিত ও আদিবাসীদের আস্থা অর্জন করতে গেলে তার জন্য দরকার হবে বিশেষ বিশেষ দাবীদাওয়া এবং বিশেষ বিশেষ সংগঠনসমূহ। ভারতে পুনর্গঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিকের অঙ্গ হিসাবে একটি লেনিনপন্থী-ট্রটস্কীপন্থী দল নিষ্ঠুর অত্যাচার, অবিচার ও দারিদ্র্যের অন্তহীন আবর্ত থেকে মুক্তির পথ খুলে দেবার সম্ভাবনা তৈরি করে দেবে।

To contact the International Communist League (Fourth Internationalist), write to:

International Center
Box 7429 GPO, New York, NY 10116, USA • vanguard@tiac.net

Spartacist League of Australia
GPO Box 2339, Melbourne Vic 3001, Australia
spartacist@iprimus.com.au

Spartacist League/Britain
PO Box 42886, London N19 5WY, Britain
workershammer@btconnect.com

Ligue trotskyste/Trotskyist League in Quebec and Canada
C.P. 83 Succ. Place-d'Armes, Montréal, QC H2Y 3E9, Canada
trotskyste.montreal@gmail.com

Spartacist/South Africa
Spartacist, P.O. Box 61574, Marshalltown, Johannesburg
2107, South Africa • spartacist_sa@yahoo.com

Other sections and publications at icl-fi.org